ডান নয়-বাম নয় হাঁটতে হবে বাংলাদেশ বরাবর–

MARCH FOR BANGLADESH

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধান-এর ৬০ ধারার বাস্তবায়ন করুন।

সচেতন সামাজিক শক্তির (Social Power with Knowledge) শাসন নিশ্চিত করুন।
বিকেন্দ্রীভূত-কেন্দ্রীকরণ (Decentralized-Centralization)-এর রাষ্ট্র কাঠামো প্রতিষ্ঠা করুন।

মুক্তিজোট

প্রতিষ্ঠাঃ ১০ই অগ্রহায়ণ ১৪০৭ বঙ্গাব্দ
২৪শে নভেম্বর ২০০০ খ্রিস্টাব্দ

GLOBAL KNOWLEDGE LOCAL ACT
www.muktijot.org

স্থানীয় সরকার ভিত্তিক জাতীয় সরকার গড়ে তুলুন।
নির্বাচনী প্রতীক ছড়ি মার্কা

সূত্র নংঃ রাসাআ/২০১৭/১৫ তারিখঃ ২৪/০৮/২০১৭

নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রেরিত 'একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের কর্মপরিকল্পনা'র প্রেক্ষিতে মুক্তিজোট- এর প্রস্তাবনা

মহাত্মন,

যথাবিহিত সম্মান প্রদর্শনপূর্বক আপনাকে জানানো যাচ্ছে যে, গত ১০ই আগস্ট ২০১৭ খ্রিঃ তারিখে নির্বাচন কমিশন থেকে জাতীয় সংসদ নির্বাচন সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধানসহ আশু একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানে গৃহীত একটি কর্মপরিকল্পনা আলোচ্য প্রসঙ্গ হিসেবে আমাদের কাছে পাঠানো হয়েছে- পত্র স্মারক নং– ১৭.০০.০০০০.০৪০.৫০.০১০.১৭-২১২।

আপনাদের প্রেরিত পত্রের যে দুটো বিষয় আমাদের চোখে আলাদা গুরুত্বে ভিন্ন এক শুভ বার্তা হিসেবে ধরা দিয়েছে প্রারম্ভিকতায় সেটা উল্লেখ করেই আমরা প্রাসঙ্গিক সূচনায় প্রবেশ করবো। কারণ এমন জরুরী প্রসঙ্গ ও প্রাসঙ্গিকতা আমাদের বহু প্রতীক্ষা শেষে এক পশলা বৃষ্টির মত!

রাজনৈতিক দলসমূহের নিবন্ধন প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর যে কয়েকটা কমিশন আমরা পেয়েছি তাদের প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা রেখেই বলছি, বর্তমান কমিশনই সম্ভবত প্রথম যেখানে নির্বাচন কমিশন এর আইনি কাঠামো পর্যালোচনা ও সংস্কারকে সর্বাগ্রে গুরুত্ব দেয়া সহ বিধি-বিধান ও কর্মপরিকল্পনার সাথে ব্যাপককে জড়িয়ে নেওয়ার মধ্যে সদিচ্ছার প্রকাশ ঘটেছে। কিন্তু এর চেয়েও যেটা গুরুত্বপূর্ণ তা হলো, আইনি কাঠামো পর্যালোচনা ও সংস্কার অর্থে প্রাতিষ্ঠানিক দিকটাকে ফিরে দেখার আন্তরিক প্রচেষ্টা। প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা থাকলেও যতটুকু সুযোগ আছে তার মধ্যেই সবটুকু করার এই প্রযত্নকে ধন্যবাদ।

দ্বিতীয়তঃ প্রেরিত পত্রে যিনি স্বাক্ষর করেছেন তিনিই স্বহস্তে শুরুতে লিখেছেন 'প্রিয় মহোদয়' এবং শেষে লিখে দিয়েছেন 'শ্রদ্ধান্তে'। আমরা চমকে উঠলাম! বিশেষতঃ রাজনীতি মানেই যেখানে ব্লেম অথবা ভিলেন, রাজনীতিকে প্রতিপক্ষ করে তোলার এমনি এক বাজারী দুঃসময়ে- বড় বেশী দূর্লভ আর দূরবর্তী হয়ে ওঠা ইতিহাসবদ্ধ একটি বোধ এবং তা জীবিত রাজনীতিকদের ঘিরে... আর সেটা কোনো দায়িত্বসীন মানুষের কলমে! আমাদের শ্রদ্ধা-ভাললাগা আর ভালবাসা জড়ানো চোখেই দেখলাম তিনি বর্তমান কমিশনে ভারপ্রাপ্ত সচিব এর আসনে আসীন- ধন্যবাদ জনাব হেলালুদ্দীন আহমদকে; নিশ্চিতভাবেই আমরা জানি তিনি মাননীয় নির্বাচন কমিশনারের সযত্ন প্রয়াস সহ বর্তমান কমিশনের রুচিশীলতারই প্রতিবিম্বিত রূপ।

রাজনীতিক আপনত্বের এই সুরটুকু বেঁচে থাকুক- শেষ পর্যন্ত, এই দেশ ও দেশের মানুষের স্বার্থে।

কারণ সারা দেশ সাধু-সন্ত-পীর-মাশায়েখে ভরে উঠলেও রাজনীতিটা পঁচে গেলে দেশ রসাতলে যাবে আর সারা দেশ যদি গুন্ডা-বদমায়েশে ছেয়ে যায় এবং রাজনীতিটা উন্নত হয় তবে অচিরেই সে নৈরাজ্য থেমে- দেশ বেঁচে উঠবে। দেশ রাজনীতি মারফত বাঁচে বলেই রাজনীতিহীন দেশের হদিস কারও জানা নেই। তাই রাজনীতির বিকল্প কেবল রাজনীতিই থাকে। সমালোচনাকে সুস্থতার অনিবার্য শর্ত বলা গেলেও রাজনীতিকেই প্রতিপক্ষতার নামান্তর করে ফেলাটা স্রেফ দেশদ্রোহীতা।

এই বোধ থেকেই–

প্রাসঙ্গিক সূচনাতে সবাইকে অভিনন্দন।

বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক মুক্তিজোট
কেন্দ্রীয় কার্যালয়ঃ ১২৮/৩, পূর্ব তেজতুরী বাজার, কাওরান বাজার, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫
ফোনঃ ০২-৮১৮০১৮১, ফ্যাক্সঃ ০২-৮১৮০১৮০ ওয়েবঃ www.muktijot.org ই-মেইলঃ info@muktijot.org

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রেরিত 'একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের কর্মপরিকল্পনা' পাঠে আমাদের মনে হয়েছে প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গগুলোর সাথে অনেক সূক্ষ্ম বিষয়গুলোও আমলে রাখা হয়েছে। তাই কমিশনের প্রতি আস্থা রেখে নির্বাচন কমিশনের জনবল বৃদ্ধিসহ মূখ্যতঃ দুটো বিষয়কে প্রণিধান করে আমরা মতামত জানাচ্ছি।

প্রথমত, সম্ভব হলে নির্বাচন কমিশনের সাথে রাজনৈতিক দলসমূহের পারস্পরিক সম্পর্কের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দান তথা 'জাতীয় পরিষদ' গঠন করতঃ বিধি-বিধানগুলো পুনঃনির্দিষ্ট বা সংস্কার করলেই কেবল তা যথাযথ হতে পারে। 'সম্ভব হলে' বলছি কারণ এক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন মূল প্রসঙ্গ থাকলেও শেষ পর্যন্ত সরকার সংশ্লিষ্টতা এসে পড়ে। যদিও কর্মপরিকল্পনার ১নং এ উল্লিখিত আইনি কাঠামো পর্যালোচনা ও সংস্কার প্রসঙ্গটা পক্ষান্তরে আলোচ্য ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট গন্ডিবদ্ধতাকে ছাড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাকেই অনুমোদন দেয়।

দ্বিতীয়ত, নির্বাচন কমিশনের সাথে রাজনৈতিক দলের পারস্পরিক সম্পর্ক আবর্তিত হয় যে নির্বাচনকে ঘিরে- তার মূল প্রসঙ্গেই থাকে ভোট ও ভোটার। তাই ভোট ও ভোটার প্রসঙ্গে 'প্রত্যেক নাগরিক তার স্থায়ী ঠিকানায় ভোটার থাকবেন' এই প্রস্তাবনার মধ্য দিয়ে কর্মপরিকল্পনার ২ নং, ৩নং, ৪নং সহ অপরাপর প্রসঙ্গকেও সম্পৃক্ত করে।

<u>কর্মপরিকল্পনার ১নং এবং ৬ নং- এ উল্লিখিত আইনি কাঠামো পর্যালোচনা ও সংস্কার এবং নিবন্ধন ও নিরীক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের প্রস্তাবনাঃ</u>

রাজনৈতিক দল কে নিবন্ধন দেয়ার সাথে সাথে উক্ত দলের প্রধান কে অথেনটিক মর্যাদায় নির্দিষ্ট করতে হবে এবং উক্ত দলীয় প্রধানদের সমন্বয়ে গঠিত হবে জাতীয় পরিষদ। এভাবে পদাধিকারবলে প্রত্যেক দলীয় প্রধান জাতীয় পরিষদের সদস্য হিসেবে রাষ্ট্র কর্তৃক অথেনটিক মর্যাদায় নির্দিষ্ট হবেন এবং উক্ত জাতীয় পরিষদ দ্বারা নির্বাচন ও রাজনৈতিক দল সংক্রান্ত বিধি-বিধানগুলো পুনঃনির্দিষ্ট বা সংস্কার করে প্রণয়ন করলেই কেবল তা যথার্থ হতে পারে। কারন উক্ত বিধি-বিধানগুলো বহন করতে হয় রাজনৈতিক দল সমূহকে এবং প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা বা অভিজ্ঞান থাকে কেবল রাজনৈতিক দল সমূহের।

প্রেক্ষিতঃ

আমরা মনে করি, একজনে যেমন সমাজ হয় না তেমনি সেই সমাজবদ্ধ মানুষের ক্ষেত্রেও একজনে কোন সংগঠনও হয় না। তাই একাধিককে সংবদ্ধকরণে যে 'মাধ্যম' বা প্রক্রিয়া তাই সাধারণভাবে কাঠামো অর্থে গৃহীত। নিঃসন্দেহে তা পারস্পারিকতার শর্তকেই বহন করে মাত্র। আর এই পারস্পারিকতার শর্তেই থাকে বিধি-বিধানসমূহ এবং এটা সামগ্রীকতাকে নিয়ে ক্রিয়াশীল বা সমন্বিতকরণেই আসে র‍্যাঙ্ক এন্ড ফাইল বা কর্তৃত্ব তথা কাঠামোগত প্রক্রিয়ার বিভিন্ন দিক; চেক এন্ড ব্যালান্স সমেত যেটাকে এক কথায় আমরা কাঠামোগত রূপ বা প্রতিষ্ঠান হিসেবে বুঝি।

তাই আইনি কাঠামো পর্যালোচনা ও সংস্কারসহ তার বিধি-বিধান প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে নির্বাচন কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক রূপটাই এসে পড়ে। বিশেষতঃ রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার প্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ ও তার রূপান্তরের প্রসঙ্গটা অনিবার্য হয়ে পড়েছে। কারণ বিধি-বিধান সংস্কার বা গ্রহন বর্জন প্রসঙ্গটা প্রাতিষ্ঠানিকতার অনুবর্তী।

এক্ষেত্রে, রাজনৈতিক দলসহ যারা মতামত দিচ্ছেন এবং বিচার বিশ্লেষনপূর্বক তা গৃহীত বা বিধি হিসেবে প্রণীত হবার পর উক্ত পরামর্শ প্রদানকারীদের মধ্যে কেবল যে পক্ষটিকেই প্রত্যক্ষভাবে উক্ত বিধি-বিধান বহন বা পালন করতে হয়, সেখানে শুধু রাজনৈতিক দলসমূহই থাকে আর তা বাস্তবায়িত না হলেও সে ব্যর্থতার দায়ভার বা অভিযোগ- অনুযোগ কেবল রাজনৈতিক দলগুলোর কাঁধেই বর্তায়। এমনকি তা যদি বাস্তবতা বিবর্জিতও হয় সে প্রসঙ্গে পারস্পারিক আলোচনা বা শুধরানোর সুযোগ নির্বাচন কমিশনের সাথে রাজনৈতিক দলসমূহের নেই (Representation of the People Order, 1972 এর 90F(1)(e) আদেশটির কথা বলা গেলেও এক্ষেত্রে তা অ-প্রাসঙ্গিক যা নিম্নে আলোচিত হয়েছে)। অর্থাৎ বিধি যাদের জন্য প্রণয়ন করা হয় সেই রাজনৈতিক দলসমূহের সাথে যিনি বা যাঁরা (নির্বাচন কমিশন) প্রণয়ন করছেন তাদের উভয়ের পারস্পারিক সম্পর্কের কোনো প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নেই- যার পুরোটাই একতরফা! মোটকথা তা প্রাতিষ্ঠানিক বৈশিষ্ট্যেরই

বিপরীতে দাঁড়িয়ে আছে। প্রাতিষ্ঠানিক নৈর্ব্যক্তিকতার পরিবর্তে এখনও তা একান্তই ব্যক্তি ইচ্ছা নির্ভর হয়ে চলছে। যদিও পুরো প্রক্রিয়ার মধ্যে প্রধানত প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক অভিজ্ঞান বা বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে থাকে কেবল রাজনৈতিক দলসমূহ।

এক্ষেত্রে নিবন্ধনের শর্তে প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্ক থাকলেও নীতি-বিধিসহ সামগ্রীক ক্ষেত্রে পারস্পরিক সে সম্পর্ক বা মতবিনিময় তথা আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট বিধি-বিধান দ্বারা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ না পাওয়ায়- নির্বাচন কমিশন ও রাজনৈতিক দল উভয় পক্ষই অনাহুত বিতর্কের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে। নীতি-বিধি সহ যে কোনো বিষয়ের মীমাংসা করতে হলেও রাজনৈতিক দলসমূহকে আদালতের দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া কোনো গত্যান্তর থাকছে না।

যেমন, দলীয় প্রতীকে স্থানীয় নির্বাচন করার প্রসঙ্গটির সুরাহায় গত নির্বাচন কমিশনকে বিবাদী করে আমরা (মুক্তিজোট) আদালতে রিট (রিট পিটিশন নং ৩৬৯১/২০১৫) করতে বাধ্য হয়েছিলাম। অথচ উক্ত কমিশন থেকে যে দুটি দল নিবন্ধন পেতে সক্ষম হয়, তার মধ্যে ‘বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক মুক্তিজোট (মুক্তিজোট)’ প্রথম নিবন্ধিত হয় (০৮ই অক্টোবর ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ, নিবন্ধন নং– ৪১)। এক্ষেত্রে বিগত কমিশনের প্রথম নিবন্ধন প্রাপ্ত এবং একশ টা উপজেলার পরিবর্তে সংগঠন প্রতিষ্ঠার দ্বাদশ বর্ষ (১২ বছর) পূর্তি উপলক্ষ্যে আমরা ১০০+১২ = ১১২ টা উপজেলা ও ২২ টা জেলার প্রেক্ষিতে আমরা ২২+১২ = ৩৪ টি জেলার কার্যক্রম এবং প্রতি উপজেলায় ২০০ ভোটার যা মোট হিসেবে (112x200) = ২২৪০০ জন ভোটার সমর্থকের তথ্য জমা দিয়ে নিবন্ধন নিয়েছিলাম। অর্থাৎ তখনও বিস্মৃতির দূরবর্তিতায় এতটা পারস্পরিকতাহীন হয়ে উঠার কথা ছিল না যাতে আমাদের আদালতের দ্বারস্থ হতে হয়।

যদিও মুক্তিজোটের সেই রীটের পথ ধরেই আজ সারা দেশব্যাপী দলীয় প্রতীকে স্থানীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের মতো যুগান্তকারী ঘটনা ঘটেছে কিন্তু যুগপৎ কমিশনের বিপক্ষে আদালতের দ্বারস্থ হওয়াটা ছিল নির্বাচন কমিশনের সাথে রাজনৈতিক দল সমূহের পারস্পরিক সম্পর্কের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ না থাকারই জের বা একটি প্রামাণিক দৃষ্টান্ত। যে কারণে শুরুতেই বলে এসেছি এটা ‘আমাদের বহু প্রতীক্ষা শেষে এক পশলা বৃষ্টির মত’।

সেই সাথে এমন অনেক বিধি-বিধান রয়েছে যা সাধারণভাবে ইতিবাচক মনে হলেও বাস্তবের সাথে সংযোগ নেই, উপরন্ত রাজনীতি প্রাসঙ্গিকতায় তা একেবারেই যায় না। ফলে সারগতভাবে তাকে ‘বাজে কথার ফুলের চাষ’ বললেও অত্যুক্তি হয় না।

যেমনঃ-

Representation of the People Order,1972 এর 90B(1)(b)(iii) অনুসারে- মূল সংগঠন থেকে অঙ্গ সংগঠনগুলোকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে।

এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, একমাত্র ছাত্র সংগঠনই কোনও পেশাগত সংগঠন নয় বরং পেশাগত জীবনের প্রাক পর্ব- বা প্রস্তুতি পর্ব। তাই ছাত্র সংগঠনের সাথে অপরাপর পেশাগত সংগঠনের মৌলিক পার্থক্য রয়েছে।

পেশাগত সংগঠনগুলো মিলেমিশেই একটি ‘কমন ব্যানার’ যা মূল সংগঠনের রূপ পরিগ্রহ করে। ফলে পেশাজীবী সংগঠনের বাইরে ‘মূল সংগঠন’- এর অস্তিত্ব অবান্তর হয়ে যায় কারণ সেটা হলে তা সমগ্রের বৈশিষ্ট্য হারিয়ে অংশের বৈশিষ্ট্য ধারণ করে। অর্থাৎ রাজনীতি কোন পেশা নয় বলে তা সংগঠন হিসেবে অপরাপর পেশার সমন্বিত রূপ অর্থে মূল সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য নিয়ে অস্তিত্বপূর্ণ হয়। এক্ষেত্রে সেই মূলগত বৈশিষ্ট্য দ্বারা এই বিধিটা নির্দিষ্ট হয়নি। বরং ছাত্র সংগঠনের ভিন্নতার যুক্তিযুক্ততার উপর দাড়িয়ে অপরাপর পেশা বা অঙ্গ সংগঠনগুলোকে বিচার করে বিচ্ছিন্ন করার বিধি প্রণীত হয়েছে।

তাছাড়া রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার কমন সেন্সটুকুও এক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়নি। কারণ রাজনীতির স্বাভাবিক প্রক্রিয়া অনুসারে অঙ্গ সংগঠনগুলো মারফতই জাতীয় জীবনের দাবিগুলো (আর্থ-সামাজিক ইস্যু) উঠে আসে আর মূল সংগঠন মারফত (সাধারণভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাসীন) তা বাস্তবায়িত হয়। আর সে শর্তেই জাতীয় নির্বাচনের সময় মূল সংগঠন ও অঙ্গ সংগঠনগুলো এক প্রতীকে এক ব্যানারে একটিই দল হয়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে অঙ্গ সংগঠনগুলো বিচ্ছিন্ন হলে রাজনৈতিক প্রক্রিয়াটাই এলোমেলো হয়ে পড়ে তথা জাতীয় রাজনীতিটাই ক্রমশ দূর্বল

হয়ে পড়ে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে কোন মানদণ্ডই ক্রিয়াশীল ছিল না বিধায় রাজনীতি প্রাসঙ্গিকতায় রাজনৈতিক প্রক্রিয়া সমেত মূল সংগঠনের প্রধান বৈশিষ্ট্যই বা শিকড়টাই কাটা পড়েছে। এটা তৎকালীন রাজনীতিহীন উপদেশ খয়রাতিরই বহিঃপ্রকাশ!

সুতরাং নির্বাচন কমিশনের সাথে রাজনৈতিক দলসমূহের পারস্পরিক সম্পর্কের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দান অনিবার্য। এক্ষেত্রে Representation of the People Order,1972 এর 90F(1)(e) এর কথা বলা গেলেও প্রাতিষ্ঠানিক সংজ্ঞায় তা অপ্রাসঙ্গিক। কারণ সেটাও কোনো একটি দলের জন্য নিজস্ব আইনগত অধিকার হিসেবে স্বীকৃত। কিন্তু যে বিধিগুলো আসে তা সকল রাজনৈতিক দলকেই বহন করতে হয় অর্থাৎ বহনের ক্ষেত্রে সম্মিলিত হলেও আনুষ্ঠানিক ক্ষেত্রে কোনো সমন্বিত বা যৌথ করণের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ অনুপস্থিত তথা প্রাতিষ্ঠানিক শর্ত বিযুক্ত। অর্থাৎ যেকোনো প্রয়োজনে যে কোনো সময় যে কোনো নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলকে ডেকে নির্বাচন কমিশন বসতেই পারেন– প্রাতিষ্ঠানিক কর্তৃত্বের দিক থেকে সেটা হতেই হবে; পক্ষান্তরে পূর্বোক্ত বিধি মোতাবেক রাজনৈতিক দলগুলোও তা পারে। কিন্তু পারস্পরিক সম্পর্কের বিধিবদ্ধতায় সমন্বিত রূপ বা যৌথ করণের শর্ত বিযুক্ত থাকায় তা অনানুষ্ঠানিক বা অপ্রাতিষ্ঠানিক হিসেবে নির্দিষ্ট হয়ে পড়ে।

এই একতরফা বা এক পাক্ষিক তথা একক হওয়ার শর্তে প্রজাতন্ত্রে শুধু একজনই থাকেন– তিনি মহামান্য রাষ্ট্রপতি।

এছাড়া প্রজাতন্ত্রের সকল প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেই বিধিবদ্ধ পারস্পরিক সম্পর্ক তথা চেক এন্ড ব্যালেন্স অনিবার্য। প্রজাতন্ত্র কর্তৃক নির্বাচন কমিশন, নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা প্রণয়নের কর্তৃত্ব পেলেও রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার ভিত্তিতে তার চেক এন্ড ব্যালেন্স এর শর্ত এসেগেছে। তাই বিধিগুলো যথার্থ হওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে। কিন্তু অদ্যাবধি তা প্রাতিষ্ঠানিক বৈশিষ্ট্যেও রূপ না পাওয়া এবং যতক্ষণ তা না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত রাজনৈতিক দলের জন্য এই নিবন্ধন যা তার অর্জন হলেও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে তা আমলাতান্ত্রিক মুচলেকার মত অমর্যাদাকর হয়ে থাকবে।

দেশ যাঁরা চালান দলও তাঁরাই চালান এবং সেই দলগুলো অনুমোদিত হয় যে প্রতিষ্ঠান মারফত সেই প্রতিষ্ঠানের প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকর্তা হন তাঁদের রাজনৈতিক মর্যাদার মুকুটে শোভিত পালকের মত। শিক্ষকের মর্যাদা ছাড়া যেমন শিক্ষা হয় না তেমনি কোনো রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন প্রাপ্তির সময়ে তার অথেনটিকতা রাষ্ট্রপক্ষ দ্বারা প্রাতিষ্ঠানিক মর্যাদায় স্বীকৃত না হলে–উভয়ের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে তা এক ধরণের দায়বদ্ধতাহীন বেওয়ারিশ সংস্কৃতির জন্ম দেয়। অর্থাৎ প্রাতিষ্ঠানিক বিধিবদ্ধতা দ্বারা উভয়ের সম্পর্ক নির্দিষ্ট না হলে রাজনৈতিক নেতৃত্বকে পেতে মাঝে মাঝে ‘ফোকাল পয়েন্ট’ এর মত অপ্রাতিষ্ঠানিক গবেষণায় মাথা খাটানো চলতেই থাকবে; এমনকি কমিশন ডাকবে আর ইচ্ছে হলে যে কেউ তা উপেক্ষাও করবে। তাই নির্বাচন কমিশন এবং নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মর্যাদাপূর্ণ প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা এত জরুরী হয়ে পড়েছে।

সেক্ষেত্রে, **নির্বাচন কমিশন এবং নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলসমূহের পারস্পরিক সম্পর্কের যৌথ বা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ আসতে পারে জাতীয় পরিষদ গঠনের মধ্য দিয়ে। এক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন ও নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল সমূহের পারস্পারিক এই যৌথ সভা বা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ তথা জাতীয় পরিষদ পক্ষান্তরে রাজনৈতিক দল সমূহের জন্য সমন্বিত সভার রূপ পরিগ্রহ করবে।**

জাতীয় পরিষদ

‘পরমত সহিষ্ণুতা’ গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি হিসেবে নির্দিষ্ট হলেও গণতন্ত্র বা বহুদলীয় শাসন ব্যবস্থা স্থিতিশীলতা লাভ করে কেবল প্রাতিষ্ঠানিকতার মধ্যে দিয়ে। যেখানে এই প্রাতিষ্ঠানিকতার দিকটি গড়ে ওঠে না সেখানেই গনতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা অস্থিতিশীল হয়ে থাকে এবং যথারীতি পরমত সহিষ্ণুত তথা রাজনৈতিক দলসমূহের পারস্পারিক বিশ্বাস-আস্থার দিকটা এগুতে পারে না। প্রস্তাবিত, নির্বাচন কমিশন ও নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল সমূহের পারস্পারিক এই যৌথ সভা বা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ তথা জাতীয় পরিষদ– যা রাজনৈতিক দল সমূহের জন্য সমন্বিত সভা হিসেবে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির অনিবার্য শর্তকে পূরণ করে।

আমরা আইন না করে সার্চ কমিটি গঠন করি, নিজেদের পারস্পারিক বিশ্বাস-আস্থার ঘাটতি পূরণ করতে সংসদে বসে ঠান্ডা মাথায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের তত্ত্ব পাশ করি, এমনকি তার ফ্রাঙ্কেনস্টাইন রূপ দেখেও এখনও আমরা কেউ কেউ সহায়ক সরকারের দাবী করছি কিংবা সরকার হিসেবে সহায়তাও করতে চাচ্ছি অথচ ইতোমধ্যে তা অ-সাংবিধানিক হিসেবে প্রমাণিত। তথাপিও যে শর্তে সহায়তা করা যায় সে শর্তেই কে্উ সহায়ক সরকারের দাবী তুলতেই পারে। মূখ্যত নির্বাচন কমিশন দুটো মন্ত্রণালয়ের হয়ে সরকারমুখীন থাকে। মুক্তিজোট গতবার নিবন্ধন সার্টিফিকেট হাতে নিয়ে প্রথম মিডিয়া ব্রিফিং এ কমিশনের বারান্দায় দাড়িয়ে বলেছিল নির্বাচন কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতাসহ নির্বাচনকালীন সময়ে স্বরাষ্ট্র এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় নির্বাচন কমিশনকে দেওয়ার আইন পাশ করতে হবে। ইতোমধ্যে একটা নির্বাচন হয়ে গেছে, আরেকটি নির্বাচন আসন্ন, সহায়তা করার সদিচ্ছাটুকু নির্বাচন পর্যন্ত প্রতীক্ষায় কেন? বরং সে আইনটা পূর্বে করলেই তো এমন অ-সাংবিধানিক বিষয়টা উঠে আসার সুযোগ পেত না বা পায় না। আমরা রাজনীতি করি, সরকার গঠন করি কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিকতাকে আমলে নিতে চাই না। অথচ গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা শুধু প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানের মধ্যে স্থিতিশীল হতে পারে এবং তা প্রায় একমাত্র পথ হিসেবে বহুদলীয় শাসন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে স্বতঃসিদ্ধ হয়ে উঠছে সেটা আমরা যেনো ভাবতেই চাচ্ছি না।

<u>জাতীয় পরিষদ-এর গঠন বা কাঠামোগত দিশাঃ</u>

নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলসমূহের দলীয় প্রধানদের সমন্বয়ে গঠিত হবে জাতীয় পরিষদ। অর্থাৎ নিবন্ধন প্রাপ্তির পথ ধরে দলীয় প্রধানগণ পদাধিকার বলে জাতীয় পরিষদের সদস্য হিসেবে রাষ্ট্র কর্তৃক অথেনটিক মর্যাদায় নির্দিষ্ট হবেন। জাতীয় পরিষদের সদস্যগণ সংসদ সদস্যর সমমান বহন করবেন। জাতীয় পরিষদের সাধারণ কর্ম নির্বাহের জন্য আহ্বায়ক হিসেবে নির্দিষ্ট থাকবেন পদাধিকার বলে মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার। আর উক্ত জাতীয় পরিষদের প্রধান তথা চূড়ান্ত নির্দেশদানকারী কর্তৃত্বে থাকবেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি।

যুক্তিবিধানঃ-

প্রথমতঃ- সংসদ সদস্যের সমমান আর সংসদ সদস্য সমার্থক নয়। এক্ষেত্রে সংসদ সদস্যের সমমানে নিরাপত্তাসহ অপরাপর সুবিধা পেলেও সংসদ কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ বা জনগণের জন্য আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রযুক্ত থাকবে না। অর্থাৎ রাষ্ট্র তথা প্রতিষ্ঠানগত শর্তে প্রাতিষ্ঠানিক মর্যাদা পেলেও জনগণের জন্য আইন করার বৈধতা বা সরকার গঠনে কেবল জনগণের রায়ে নির্বাচিত হওয়ার মধ্যে দিয়ে অর্জিত হবে। এটা কেউ কাউকে দিতে পারে না– কেবল জনগণই পারে।

কিন্তু সংসদে থাক বা না-থাক কোনো রাজনৈতিক দল নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধিত হওয়ার শর্তে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক গৃহীত বিধি বিধানের আওতার বাইরে থাকতে পারে না। সে অর্থেই জাতীয় পরিষদের প্রাতিষ্ঠানিক যুক্তিযুক্ততা গৃহীত হয় এবং জাতীয় পরিষদ গঠিত হলেও এক্ষেত্রে এই যুক্তিযুক্ততার কারণে **গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধান- এর অনুচেছদ ১২৪** এর কোনো ব্যত্যয় ঘটে না।

দ্বিতীয়তঃ রাজনৈতিক দল মাত্রই প্রত্যক্ষ জনগণ সংশ্লিষ্ট তথা জণগণের মধ্যে তাকে ফিরতেই হয়। জনগণের প্রতি এই দায়বদ্ধতার বৈশিষ্ট্যের কারণেই প্রাতিষ্ঠানিক এই স্বীকৃতিটা যুক্তিযুক্ততা পায়। কারণ যারা নির্বাচিত হয়ে সরকার গঠন করেন তাঁরা কোনো না কোনো রাজনৈতিক দল বা দলের প্রতিনিধিত্ব করেন।

অতএব, উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে আমাদের সিদ্ধান্ত- **নির্বাচন কমিশনের সাথে রাজনৈতিক দলসমূহের পারস্পরিক সম্পর্কের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দান তথা জাতীয় পরিষদ গঠন করে বিধি-বিধানগুলো পুনঃনির্দিষ্ট বা সংস্কার করতে হবে।**

<u>কর্মপরিকল্পনার ২নং ও ৩নং বিষয় প্রাসঙ্গিক আমাদের প্রস্তাবনাঃ</u>

i) 'প্রত্যেক নাগরিক তার স্থায়ী ঠিকানায় ভোটার থাকবেন'। এক্ষেত্রে প্রার্থী এবং প্রবাসী স্থায়ী ঠিকানায় ভোটার থাকলেও ভোটাধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে তার ব্যত্যয় থাকবে ।

ii) কর্মপরিকল্পনার ২নং ও ৩নং এ উল্লিখিত জনসংখ্যা, ভোটার সংখ্যা এবং সংসদীয় এলাকার আয়তন অনুসারে সীমানা পুনর্নির্ধারণ প্রসঙ্গ রয়েছে, সেক্ষেত্রে তা 'স্থায়ী ঠিকানায় ভোটার' ভিত্তিক হলে অনেক সহজ হয়। বিশেষত শহরমুখীন বা নাগরিক জীবনের পেশাভিত্তিক অবিরাম যে পরিবর্তমান 'বর্তমান ঠিকানা' তাতে সীমানা নির্ধারণে উদ্ভুত অস্থিতিশীলতা ও জটিলতা হ্রাস পাবে।

প্রেক্ষিতঃ ভোট প্রসঙ্গে বরাবরই নিরাপত্তার বিষয়টিই প্রাধান্যে উঠে এসেছে। আর নিরাপত্তার ক্ষেত্রে যথারীতি আইন-শৃঙ্খলা তথা কেবল রাষ্ট্রীয় দায়-দায়িত্ব এমনকি সেনা বাহিনীর প্রসঙ্গটাও আলোচিত হচ্ছে।

অথচ দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব বা স্থিতিশীলতার প্রধান নিয়ামক হিসেবে আমাদের স্থানীক বা সামাজিক দিকটিই যে জড়িয়ে সেটা বরাবরই উপেক্ষিত থাকছে। নির্বাচন শুধু ক্ষমতায় আসা যাওয়া বা সরকার গঠনের সাথেই সম্পর্কিত নয় বরং নাগরিক অধিকার ও দায়িত্ব তথা নাগরিক সম্পর্ক হয়ে তা জাতীয় স্থিতিশীলতার সাথে সম্পর্কিত- যা অনিবার্যভাবেই আমাদের সমাজগত দিকটাকেই নির্দেশ করে।

পাশ্চাত্য সমাজ রাষ্ট্র সংশ্লিষ্ট হয়েই প্রধানত স্থিতিশীলতা লাভ করেছে কিন্তু আমাদের সমাজ রাষ্ট্র-নির্ভরতায় নয় প্রধানত স্বয়ম্ভর আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে স্বকীয় নিরাপত্তা বা স্থিতিশীলতায় থেকেছে। মূলত communication revolution তথা ইন্টারনেট, স্যাটেলাইট ইত্যাদি বিশেষত মোবাইল ফোনের বিস্তারের সাথে সাথে প্রযুক্তিগত অভিঘাতেই শত শত বছরের পুরনো এই সমাজটা নড়ে উঠেছে এবং যথারীতি তার সংহতকরণে রাষ্ট্রীয় কাঠামোগত রূপান্তর তথা জনসংশ্লিষ্ট সব ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রের প্রসঙ্গটাও ক্রমশ অনিবার্য হয়ে উঠছে। তথাপিও নাগরিক সম্পর্ককে সামাজিক সম্পর্কের সাথে সংশ্লিষ্ট করেই আমাদের দীর্ঘস্থায়ী স্থিতিশীলতার ভাবনা ভাবা উচিত। কারন স্বাধীনতার প্রায় অর্ধশত বছর কেটে গেলেও দেশ গড়ে তোলার প্রশ্নে তাকে ভিতর থেকে বুঝে স্থিতিশীলতার সে দিকটিকে আমলে নেওয়া হয়নি।

পাশ্চাত্য ফ্রেমে বাঁধা চোখে আমাদের ভূ-প্রকৃতি না বুঝে যেমন আমরা নদী শাসন করেছি– যত্রতত্র কালভার্ট, ব্রীজ দিয়ে বৃষ্টি হওয়া মাত্রই দেশকে বানভাসি বানিয়েছি তেমনি নিরাপত্তা সহ জন-শাসনের সব ক্ষেত্রেই কেবল তাৎক্ষণিক দাওয়াইটাই এযাবৎকাল মাথায় থেকেছে। এক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের উপর আস্থা রেখেই আমরা কেবল দীর্ঘস্থায়ী স্থিতিশীলতার শর্তে সামাজিক দিকটাকে ব্যবহার করার প্রস্তাব রাখছি। 'প্রত্যেক নাগরিক তার স্থায়ী ঠিকানায় ভোটার থাকলে' নির্বাচনটা সামাজিক উৎসবের রূপ নেবে। সেক্ষেত্রে ৫ বছর পরপর ৫ দিনের জন্য নির্বাচনী ছুটির অনুমতি হয়ে উঠতে পারে 'ঘরে ফেরা'র সবচেয়ে বড় উৎসব। বর্তমান কমিশনের উদ্যোগ হতে পারে যার পথিকৃৎ। 'প্রত্যেক নাগরিক তার স্থায়ী ঠিকানায় ভোটার থাকবেন' এই প্রস্তাব ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে একটি নাগরিক উৎসবের আহ্বানও বটে।

<u>কর্মপরিকল্পনার ২নং, ৪নং, ৫নং ও ৭নং বিষয় প্রাসঙ্গিক অপরাপর প্রস্তাবনাঃ</u>

i) ই- ভোটিং এর ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত দক্ষতার সাথে সাথে ব্যাপক জনসমাজের মননগত প্রস্তুতিটাও প্রয়োজন আছে। সেদিকটাকে মাথায় রেখে প্রথমে সল্প পরিসরে স্থানীয় নির্বাচন গুলোতে ই- ভোটিং এর প্রয়োগ করে করে পরবর্তীতে জাতীয় নির্বাচন প্রসঙ্গে ভাবা যেতে পারে। কারণ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সর্বোচ্চ, সেখানে পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিষয়টা অবান্তর। অতএব, এর জন্য আমাদের প্রস্তুতি ও প্রতীক্ষাই শ্রেয়।

ii) কর্মপরিকল্পনার ২নং ও ৪নং ঃ ভোটার তালিকা সরবরাহ এবং তা যুগোপযোগী করার ক্ষেত্রে Representation of the People Order,1972 এর 90F(1)(c) তে উল্লিখিত সিডি/ডিভিডি প্রসঙ্গটা রয়েছে। তথাপিও প্রযুক্তিগত উত্তরণ সাযুজ্যে অত্যাবশ্যকীয় হল নির্বাচন কমিশনের ওয়েব সাইটে তা থাকা এবং নিবন্ধিত দল সমূহের কাছে ই-মেইল মারফত প্রেরণ বা সরবরাহ করা। এতে ভোটারমাত্রই তার ভোট সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সহজেই পাবে এবং প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয় সহ অনেক জটিলতার নিরসন হবে।

iii) কর্মপরিকল্পনার ৫নং ঃ প্রবাসী ভোটারদের জন্য সংশ্লিষ্ট দেশে বাংলাদেশী দূতাবাস মারফত ভোট কেন্দ্র স্থাপনপূর্বক ভোটের ব্যবস্থা করতে হবে।

iv) কর্মপরিকল্পনার ৭নং ঃ নির্বাচন কমিশনের জনবল প্রাসঙ্গিক তথ্য জেনে আমরা বিস্মিত হয়েছি! কর্মপরিকল্পনায় উল্লিখিত তথ্য অনুসারে নির্বাচন কমিশনের মোট জনবল প্রায় ৩০০০ জন। এর মধ্যে সদও দপ্তওে রয়েছে ৩০০ জনের অধিক আর বাকী ২৭০০ জন ৬৪ জেলা ও ৫০৬টি উপজেলাতে হলে মোট ৫৭০ অফিসে সাড়ে চারজন করে হয়। তাহলে প্রায় ১০ কোটির অধিক ভোটারের জন্য জনবলের চেহারাটা কেমন দেখায়? ..... 'কি বিচিত্র এদেশ সেলুকাস'! অবিলম্বে জেলা ও উপজেলায় নূন্যতম এক জন করে সহকারী নির্বাচন কর্মকর্তা নিয়োগ দিতে হবে।

পুনশ্চঃ সবাইকে ধন্যবাদ।

অনুমোদনক্রমে

আব্দুর রাজ্জাক মুল্লাহ্ রাজু শিকদার
জাতীয় সমন্বয়ক দিশারী
বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক মুক্তিজোট

শুভেচ্ছান্তে

আবু লায়েস মুন্না
সংগঠন প্রধান
বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক মুক্তিজোট
মোবাইলঃ ০১৭১১১৩২৬৩২